১২৮

ভোরের কাগজ

তারিখ 01 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

'৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাবে

শহিদুল ইসলাম

১৯৭৩ সালের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ মাত্র চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে। ১৯৭৫ সালে খুনোখুনির মাধ্যমে ঘৃণ্য রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশটি যখন পুনরায় পাকিস্তানী ভাবাদর্শের পথ অনুসরণ শুরু করে, তখন থেকে বিভিন্ন সরকার ও তার তাঁবেদার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ঐ গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে নিরন্তর অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সরকারের উচ্চতম স্থান থেকে ঐ অধ্যাদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। যার কোনো ভিত্তি নেই। সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকবৃন্দ সারা পাকিস্তান আমল জুড়ে এদের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অবৈধ সামরিক শাসকরা সমাজ ও জাতীয় জীবনের কোথাও সামান্যতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সহ্য করবেন না, তা বোঝা যায়। কিন্তু যিনি সব সময় নিজের সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে উল্লেখ করছেন, সেই খালেদা জিয়া শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সহ্য করতে পারবেন না কেন, বোঝা বেশ কষ্টকর।

যাক সে কথা। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন সরকারসমূহের প্রধান অভিযোগ হলো এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেখানে একাধিপত্য। সরকার শত চেষ্টা করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভালো কিছু করতে পারছেন না। কিছু করতে গেলেই শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বাধা আসে। শিক্ষকরা সেখানে সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করছেন। স্বৈরশাসক এরশাদ তো বলেইছিলেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র।' অর্থাৎ এরশাদের মতো কুখ্যাত স্বৈরশাসকও বিশ্ববিদ্যালয়কে বাগে আনতে পারেননি। খালেদা জিয়াও সম্ভবতঃ এরশাদের এ মত সমর্থন করেন। তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় চারটিকে এতোই ক্ষমতা দিয়েছে। নিরাসক্তভাবে এ বিষয়ে একটু হিসাব-নিকাশ করা যাক। সত্যি কি তাই? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ নিয়েই আলোচনা করবো। অন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র আলাদা কিছু হবে না। আজকের আলোচনা মূলত সিনেটের ও সিন্ডিকেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। গত ৭ ডিসেম্বর ভোরের কাগজ-এ সিন্ডিকেটের গঠন সম্পর্কে লিখেছি। পাঠক লক্ষ্য করবেন সিন্ডিকেটের ১৭ জন সদস্যের মাত্র ৬ জন শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি। উক্ত ৬ জন শিক্ষক প্রতিনিধি যদি উপাচার্য বা সরকার-বিরোধী প্যানেল থেকে নির্বাচিত হনও, তাহলেও সরকার ইচ্ছা করলে সিন্ডিকেটকে নিজের কব্জায় আনতে পারে এবং শিক্ষক ৬ জনের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে কোনো সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিতে পারে। খালেদা জিয়ার সরকার সম্প্রতি তা প্রমাণ করেছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত বর্তমানের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের পর পর দু'টি সভায় ৬ জন শিক্ষকের বিরোধিতা ও দ্বিমত প্রকাশ সত্ত্বেও দু'টি হলের নামকরণ করা হয়েছে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া হল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, 'শিক্ষকরা সিন্ডিকেটে বসে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করছে' - এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। সিন্ডিকেট নিয়ে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আজ সিনেট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

সিনেটকে বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদ। সিনেটের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা না থাকলেও সিনেট নিয়ে এতো কথাবার্তা হওয়া এবং তা দখল করার সরকারি প্রতিযোগিতার কারণ হলো, সিনেট থেকে নির্বাচিত তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে চার বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত করতে বাধ্য থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। উপাচার্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ একে সুনজরে দেখেন না। তাঁদের কথা শিক্ষকরা কেন রাজনীতি করবেন? এ কথা বলার সময় বাংলাদেশের সংবিধানসম্মত মৌলিক অধিকারের কথাটি তাঁরা বেমালুম ভুলে যান। কারণ হিসেবে তারা যেসব যুক্তি উত্থাপণ করেন তা হলো- (ক) শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতির জন্ম দেয়। (কিন্তু সে রাজনীতি যদি সরকারের পক্ষে হয়, তাদের আপত্তি থাকে না। ক্ষমতাসীন সরকারের ভয় বিরোধী রাজনীতিকে)। (খ) সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শিক্ষকরাই সিনেট নিয়ন্ত্রণ করেন এবং উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনেও তাঁরা একক ভূমিকা পালন করেন। (গ) উপাচার্য যে প্যানেল থেকে নির্বাচিত হন, সে দলের শিক্ষকবৃন্দকে নানারকম সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করতে হয়। (ঘ) উপাচার্যের পদটি খুবই সম্মানীত। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সিনেট সদস্যদের কাছে ভোটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করা একজন উপাচার্যের সম্মানের জন্য ক্ষতিকর। ফলে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গ ক্রমেই উপাচার্যের পদটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। নিম্নতর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকবৃন্দই উপাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। এতে উপাচার্যের মানের অবনমন ঘটছে।

এঁদের এসব অভিযোগ কতোদূর ধোপে টেকে তা দেখা যাক।

(ক) তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ চালু হবার পরই শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতির জন্ম হয়েছে, এ অভিযোগ মিথ্যা। ১৯৬৬ সালে এই লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেই শিক্ষকদের ক্লাব নির্বাচনের সম্মুখীন হয়। রসায়ন বিভাগের দু'জন প্রবীণতম অধ্যাপক দুই প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুবী কালাকানুন। তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ ছিল না। ভাবাদর্শিকভাবেই তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দু'টি প্যানেলে বিভক্ত হয়ে সে নির্বাচন লড়েছিলেন। একদল আইয়ুবপন্থী অর্থাৎ সামরিক শাসনের পক্ষে। অপর দলটি উদারপন্থী গণতন্ত্রী, সামরিক শাসনবিরোধী। প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে সেদিন গণতন্ত্রী দল জয়লাভ করেছিল। কাজেই শিক্ষকদের ভাবাদর্শিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে '৭৩ সালের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কতোটা যুক্তিযুক্ত পাঠক তা বিচার করবেন।

(খ) শিক্ষকরা সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ এ কথা মোটেই ঠিক নয়। সিনেটের গঠনের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হবে। ১০৩ জন সদস্য নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট গঠিত। এর মধ্যে শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষক সদস্যের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশেরও কম' ৩৩ জন। আর ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধির সংখ্যা ৫ জন। এই মুহূর্তে উপাচার্য, একজন উপউপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ- তিনজনই বর্তমান সরকার কর্তৃক মনোনীত। সরকার চাইলে আরো একজন উপউপাচার্য নিয়োগ করতে পারে। এ ছাড়া সিনেটে আছে সরকার মনোনীত ৫ জন, স্পীকার মনোনীত ৫ জন ও চ্যান্সেলর মনোনীত ৫ জন করে মোট ১৫ জন সদস্য। গবেষণা সংস্থা থেকে ৫ জন আসবেন সিন্ডিকেটের মনোনয়ন নিয়ে। দু'টি হলের নামকরণ প্রমাণ করে যে, এই মুহূর্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে এই ক্যাটেগরি থেকে সরকারের পছন্দের মানুষই মনোনয়ন পাবেন। আরো আছে শিক্ষা-পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত ৫ জন কলেজ অধ্যক্ষ এবং ১০ জন কলেজ শিক্ষক। অতীত অভিজ্ঞতা বলে যে, যে দল থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসুন না কেন, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া এই ১৫ জনের পক্ষে সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত দু'টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদ্বয় সিনেটের সদস্য। বোর্ডসমূহে চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষমতা কার হাতে দেশবাসী তা জানেন। এঁদের দু'জনকে কিছুতেই শিক্ষকদের দলভুক্ত করা যাবে না। আরো আছে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরদের দ্বারা নির্বাচিত ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি। হিসাব কষে পাঠক দেখবেন শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা ৩৮। সরকারের সরাসরি মনোনীত ১৮ জন। চাইলে গবেষণা সংস্থার ৫ জন ও কলেজের ১৫ জনকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শিক্ষা বোর্ডের দুইজন চেয়ারম্যানকে ধরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারি সদস্য সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৪০ জন। ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যায় যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সিনেটের গঠন অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে পড়েছে। বরং এককভাবে শিক্ষকরাই কিছুটা দুর্বল স্থানে রয়েছেন।

(গ) সিনেট নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে দলীয় শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার কথা অন্ততঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ অধ্যাদেশটি চালু হবার পর মাত্র একজন উপাচার্য সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে উপাচার্যের চেয়ারটিতে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন সামান্য সময়ের জন্য। অন্য সকল উপাচার্যের নিয়োগ ছিল রাজনৈতিক। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে নতুন সরকার তার বিশ্বাসভাজন একজনকে উপাচার্যের পদে বসিয়েছেন। উপাচার্যের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুটি ছিল ঢাকার গণভবন, বঙ্গভবন কিংবা এখন সুগন্ধায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক দলকে খুশি রাখার তাঁর প্রয়োজন হয় না। তবে এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, বর্তমান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত উপাচার্য যেভাবে বিশেষ কয়েকজন শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করছেন, অতীতের কোনো আমলেই এমনটি আর দেখা যায়নি। উপাচার্য নির্বাচিত হলেই দলবাজি করবেন আর সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হলে করবেন না, এমন সিদ্ধান্তের পিছনে কোনো প্রমাণ নেই।

(ঘ) যে কোনো নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচার হবেই। গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের একে খারাপ চোখে দেখার কথা নয়। এর ফলে যদি জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ উপাচার্যের পদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে থাকেন, তাহলে ধরে নিতে হবে যে নির্বাচনী প্রথা তুলে দিলে তাঁরা উপাচার্য হতে

অঃ পৃঃ দ্রঃ

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগিয়ে এলেই কি তাঁরা উপাচার্য হতে পারবেন? নির্বাচিত হওয়ার জন্য একটা কোনো পথ তাঁদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তবে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য হওয়াকেই আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন শিক্ষকরা গৌরবজনক মনে করেন।

যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী, তারা গণতন্ত্রেরও বিরোধী। এঁরা তাঁদের যুক্তির অংশ হিসেবে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কথা তোলেন। গণতন্ত্রে যে জবাবদিহিতা অপরিহার্য, ত্যদের মতো শিক্ষকরাও তা মনে করেন। প্রমাণ হিসেবে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন পদ্ধতির কথা বলা যায়। পূর্বের পদ্ধতির ত্রুটিগুলো যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন শিক্ষকরাই তার সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন এবং সিনেটের মাধ্যমে সে পদ্ধতি বাতিল করে নতুন এক প্রক্রিয়া খুঁজে বের করেন, যেখানে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার প্রশ্ন তোলা হয়, উপাচার্যের জবাবদিহিতার প্রশ্নটি ওঠে না। সরকার নিযুক্ত বর্তমান উপাচার্যের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতির খবর বার বার জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষক সমিতি ঢাকায় প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে উপাচার্যের কতিপয় দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা দেশবাসীকে জানিয়েছেন। কিন্তু উপাচার্যের নিয়োগদানকারী বর্তমান সরকার রা'টি কাটছে না। '৭৩-এর অধ্যাদেশের যদি কোনো বড়ো ধরনের ফাঁক থেকে থাকে, তাহলে সেখানে উপাচার্যের জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই বর্তমান উপাচার্য একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করতে পারছেন। তার একটা নজির আজ তুলে ধরবো।

তিয়াত্তরের অধ্যাদেশে বছরে অন্ততঃ একটি সিনেট সভা ডাকার কথা রয়েছে। সিনেটের বার্ষিক সাধারণ সভা। সে সভা ডাকার অধিকারী উপাচার্য। সেই বার্ষিক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং আগামী বছরের জন্য নতুন বাজেট প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য এক বছর পার করে দিলেও আজ পর্যন্ত সিনেটের কোনো সভা ডাকেননি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। উপাচার্য নিয়মিত সভাটি না ডাকলে কি করা হবে অধ্যাদেশের ২১ (২) উপধারায় তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

'The Vice-Chancellor ....shall upon a requisition in writing signed by not less than thirty members of the Senate convene a special meeting of the Senate'. কয়েক মাস আগে সিনেটের ৩৩ জন সদস্য সিনেটের একটি বিশেষ তলবী সভা ডাকার জন্য লিখিতভাবে দাবি জানান। উপাচার্য তাঁদের সে আবেদনে কর্ণপাত না করে ঐ ধারাটি লংঘন করে গুরুতর অপরাধ করেছেন। শিক্ষক বা সিনেট সদস্যদের এরপর এর কিছু করার কোনো উপায় অধ্যাদেশে নেই। এ সবই সরকারের গোচরে আছে। সেদিক থেকেও আইনভঙ্গকারী উপাচার্যের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তিয়াত্তরের অধ্যাদেশে শিক্ষকদের নয়, এর ফলে উপাচার্য ও ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থটিই সুরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অতীতের স্বৈরাচারী সরকারের মতো বর্তমান সরকার এতোটুকুতেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান।

শহিদুল ইসলাম: কলাম লেখক। সহযোগী অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।